International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IV, Issue-III, November 2017, Page No. 62-67
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

নবপর্যায় বঙ্গদর্শন ১৩০৮ বঙ্গাব্দ : রবীন্দ্রনাথের কবিতা চর্চা ও প্রকাশ

স্বরূপ দে
গবেষক, সিধো কানহো বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Rabindranath Tagore was a great poet and philosopher. He contributed to the Bengali literature in the late 19th and early 20th century. Tagore wrote vividly in every Genre of literature, he was a poet first of all. His poets are an inseparable part of every Bengali family where his poems are recited on all important occasions. Bankim Chandra Chattopadhyaya was established 'Bangadarshan' patrika in 1872. Rabindranath Tagore was the first editor of 'Nabaparjaya Bangadarshan' in 1901. He wrote many poems are 'Parthane', 'Kabicharit', 'Kabir Biggan', and 'Jagadish Chandra Basu' etc.

Key Words: Rabindranath Tagore, literature, poem, Bangadarshan, Nabaparjaya Bangadarshan, Philosopher.
Article DOI: 10.29032/IJHSSS.v4.i3.2017.1-10

বাংলা সাহিত্যের এক স্বনামধন্য সাহিত্যিক হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ খ্রিঃ – ১৯৪১ খ্রিঃ)। সাহিত্যের এমন কোন দিক নেই, এমন কোন শাখা নেই যে তিনি তাতে হাত বাড়াননি। শুধু হাত বাড়ানোই নয়, সাফল্যও তার নামের সঙ্গেত সমভাবে জড়িত। প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্পে তিনি যেমন পারদর্শী ছিলেন তেমনই কবিতার ক্ষেত্রেও তাঁর শৈল্পিক অনুভূতি, বিশ্ব মন কেড়ে নেয়। যে সাময়িক পত্রকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের বাড়-বাড়ন্ত, সেই সাময়িক পত্রের সঙ্গে তিনি জীবনের আগা-গোড়াই যুক্ত ছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনের সূচনা লগ্ন থেকেই সাময়িক পত্রের যোগ লক্ষ্য করা যায়। কখনও তিনি 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকা, 'বালক', 'ভারতী', 'সাধনা', 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থেকে সাহিত্য রচনা করেছেন, আবার কখনও 'হিতবাদী', 'কল্পনা', 'নবজীবন' পত্রিকাতেও তাঁর সাহিত্য সম্ভার তথা সাহিত্য রথ স্ফুরিত হয়েছে। তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ লগ্নে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাও যুগের আধুনিকতা সম্ভারে সমর্থিত হয়েছে। তাই রবীন্দ্র সাহিত্য জীবনের প্রেক্ষাপটে যে, সাময়িক পত্রের অবদান গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা নিঃশংসয়ে স্বীকার করে নেওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, "যাহা কেবলই চলে, সরে, তাহার রূপ দেখি কি করিয়া? রূপের মধ্যে তো একটা স্থিরত্ব আছে। যাহা চলিতেছে, তাহাকে যেন চলিতেছে না, এমন ভাবে না দেখিলে আমরা দেখিতেই পাই না। লাটিম যখন দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে তখন আমরা তাহাকে স্থির দেখি। মাটি ভেদ করিয়া যে অঙ্কুরটি বাহির হইয়াছে প্রতি নিমেষেই তাহার পরিবর্তন হইতেছে বলিয়াই তাহার পরিণতি ঘটে। কিন্তু যখন তাহার দিকে তাকাই সে কিছু মাত্র ব্যস্ততা দেখায় না; যেন অনন্তকাল যে এইরকম অঙ্কুর হইয়াই খুশি থাকিবে, যেন তাহার বাড়িয়া উঠিবার কোন মতলবই নাই।"[১]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮ খ্রিঃ – ১৮৯৪ খ্রিঃ) 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে। তিনি চার বছর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনা করার পর, পত্রিকার দায়িত্ব পর্যায়ক্রমে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪খ্রিঃ-১৮৮৯খ্রিঃ) ও শ্রীশ চন্দ্র মজুমদারের (১৮৬০খ্রিঃ-১৯০৮খ্রিঃ) হাতে পরে। কিন্তু শ্রীশ চন্দ্র মজুমদারের পরিচালনায় চারটি সংখ্যা বের হবার পর বঙ্কিমচন্দ্রের অসন্তোষে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের অসন্তোষের কারণ ছিল, চন্দ্রনাথ বসুর 'পষুপতি সমাজ' নামে

একটি রসরচনা, সমকালীন লেখকদের ব্যঙ্গ করেছিল, তারই সাথে বঙ্কিমচন্দ্রের স্টাইলের অনুকরণের চেষ্টা হয়েছিল। তাই রুষ্ট হয়ে সঞ্জীবচন্দ্রকে লিখলেন :

> *"শ্রীচরণেষু, অঘোর পাঠককে একটু পত্র লিখিবেন যে মাঘ মাসে বঙ্গদর্শন বাহির করিবার পক্ষে আপত্তি নাই, ভবিষ্যৎ সংখ্যার প্রতি আপত্তি আছে। অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা ভিন্ন আর বাহির করিতে দিবেন না। ইহা লিখিবেন। পত্রপাঠ ইহা লিখিবেন। চন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিতেছে। কিন্তু এটুকু হইলেও বিপদ মিটিবে না।"*[২]

ফলে ১২৯০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস থেকে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা থেকে আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। ১৮৭২ খ্রিঃ বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন যে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার শুভ সূচনা হয়েছিল, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের হাতে তা বন্ধ হয়ে যায়। তাই শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের আক্ষেপের সীমা ছিল না। সেই আক্ষেপ দূর হয় যখন রবীন্দ্রনাথ নতুনভাবে, 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ভার নেয়। শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের মজুমদার লাইব্রেরী 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' এর নতুন কার্যালয় হিসেবে চিহ্নিত হয়।[৩] ১৩০৮ এর বৈশাখ মাসে 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সংখ্যার নিবেদনটি লেখেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। তাতে তার হাতে বন্ধ হওয়া পত্রিকা আবার চালু হওয়ায় তিনি আনন্দিত হন। শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার বলেন :

> *"১২৯০ সালের কার্ত্তিক মাসে বঙ্কিম বাবুর যত্নে সঞ্জীব বাবুর হস্ত হইতে বঙ্গদর্শন আমি যখন গ্রহণ করি, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তখন ইহার সম্পাদন কার্যে প্রধান সহায় ছিলেন। ...দুর্ভাগ্যবশতঃ অকালে আমি বঙ্গদর্শন বন্ধ করিতে বাধ্য হওয়ায় তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই।"*[৪]

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এও বলেন, "বঙ্গদর্শন পুনর্জীবিত হওয়ায় আমার চিরন্তন ক্ষোভ দূর হইল। বঙ্গের প্রধান সাময়িক পত্র যে আমার হস্তে লোপ পাইয়াছিল, ইহাতে আমি বড় লজ্জিত ছিলাম। ইহার পুনঃ প্রতিষ্ঠায় এতদিনে আমি সাহিত্য সংসারে একটি ঋণমুক্ত হইলাম। যুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা ভার গ্রহণ করাতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি।"[৫]

তবে প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন না। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা চিঠি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে লেখেন, "শৈলেশরা বঙ্গদর্শনের নিদ্রিত কুম্ভকর্ণকে জাগাইবার আয়োজন করিতেছেন - যে জন্যে আমাকেও যথেষ্ট ঠেলাঠেলি লাগাইয়াছেন। এখন দিবাবসানে আমার বিশ্রামের সময় আসিয়াছে - এমনকি সাহিত্যের হাটের মাঝখানে আর বেসাতি লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে? এখন ঘরের দিকে মন টানিতেছে এখন সকল রকমেরই দোকানপাট বন্ধ করিয়া বাড়ি পৌঁছিতে পারিলে বাঁচি।"[৬] এছাড়াও তিনি যে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ভার নিতে কতটা নারাজ ছিলেন, তারও পরিচয়ও পাওয়া যায় আর একটি চিঠিতে। যেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> *"বঙ্গদর্শন ভারতী আবার আমাকে টানাটানি আরম্ভ করেছে - এ সময়ে আমার কিছুতেই বেরোতে ইচ্ছা করচে না। কি করা যায় বল ত? কোথায় পালাই?"*[৭]

তবে, 'বঙ্গদর্শনে'র প্রতি যে রবীন্দ্রনাথের একটা টান ছিল তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। প্রিয়নাথ সেনকে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> *"বঙ্গদর্শন যদি বের হয়, তোমাকে ত আসরে নারতেই হবে - হাল্ বঙ্গদর্শন বেঠকে তোমার একটা গদিও পড়বেই।"*[৮]

এইভাবে বিভিন্ন পীড়াপীড়িত মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ভার গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ এ কথা জগদীশ চন্দ্র বসুকেও জানান। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "বঙ্গদর্শন কাগজখানি পুনরুজ্জীবিত হইতেছে। আমাকে তাহার সম্পাদক করিয়াছে। মহারাজও এই পত্রটিকে আশ্রয় দান করিয়াছেন।"[৯]

যাইহোক 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' নামে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক হিসেবে পত্রিকার সাহিত্য প্রকাশের কাজ আরম্ভ করেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের আদি 'বঙ্গদর্শনে'র ভাবনাকে অক্ষুণ্ণ রেখে, নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' এও সেই ভাবনাকেই রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। যদিও রবীন্দ্রনাথের সময়সীমায় সময়ের পরিবর্তনে, পটভূমির পরিবর্তন ঘটে চলেছে, তবুও বঙ্কিম আদর্শায়িত পথকে তিনি সময়োচিত করে আধুনিকতার উত্তীরণ ঘটিয়েছেন। রক্ষা করেছেন দুই বঙ্গদর্শনের মধ্যে এক আত্মিক বন্ধন। তাই 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে'র সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> *"লোকমনোমোহিনী বহুমুখী প্রতিভার বলে বঙ্গদর্শন প্রতিষ্ঠিত; মঙ্গলময়ের মঙ্গলাশীর্ব্বাদে যে প্রতিষ্ঠা রক্ষিত হইক।"*[১০]

পূর্বেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সব শাখাতেই নিজেকে জাহির করেছেন এবং নিজেকে যোগ্য হিসেবে প্রমাণ করেছেন। তবে কাব্য, কবিতায় তাঁর আকাঙ্খা, অনুভূতি ও অনুরণনের স্পর্শ, সাহিত্যের সকল শাখাকে ছাপিয়ে গেছে। তিনি

হয়ে উঠেছেন ‘কবিগুরু’। ‘নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে’ও সেই কবিতার ছোঁয়া পাঠককে স্পর্শ করেছে। আদি ‘বঙ্গদর্শনে’ যেভাবে প্রবন্ধ, উপন্যাসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, ‘নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে’ তারই সঙ্গে ছোটগল্প ও কবিতার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক সময়োচিত ভাবনার অন্যতম উপাদান হিসেবে, কবিরা প্রকাশ করেন তাদের মনের হৃদয়াবৃত্তিকে। যা শুধু পাঠক সমাদরই হয়নি, বরং পাটকরা একত্রিত হয়েছেন তাদের জীবন দর্শনের সঙ্গে। পাঠক ও কাব্যকারের মন একই সুঁতোয় দুটি ফুলের মতো হৃদয় অনুভূতির স্পর্শে ফুটে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের বক্তব্য উদ্বৃতিযোগ্য :

“হৃদয়ের পথেই কাব্যের জন্ম, মস্তিষ্কের পথে প্রবন্ধের বিকাশ।”[১১]

তবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা চর্চা শুরু ‘বঙ্গদর্শনে’র অনেক পূর্বে। কবির বয়স যখন সাত আট বছর ঠিক সেই সময় থেকেই তাঁর কবিতা চর্চা শুরু। তবে, তার কবিতা চর্চার সূত্রপাতটি বেশ বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ ‘জীবনস্মৃতি’তে বলেছেন, তাঁর এক ভাগ্নে, নাম জ্যোতি প্রকাশ, বরকে তার থেকে একটু বড়, তিনিই কবিতা চর্চার তাঁর প্রথম পথপ্রদর্শক। সেই, জ্যোতিপ্রকাশই একদিন বাড়িতে, দুপুরবেলা ডেকে বলেন, “তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে!” বলিয়া, পয়ার ছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।”[১২] সেই থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা চর্চা শুরু। রবীন্দ্রনাথ নিজেই ‘জীবনস্মৃতি’তে বলেছেন:

“গোটাকয়েক শব্দ নিজের হাতে জোড়াতাড়া দিতেই যখন তাহা পয়ার হইয়া উটিল, তখন আর পদ্য রচনার মহিমা সম্বন্ধে মোহ আর টিকিল না।”[১৩]

তিনি এও বলেছেন, “নিজেই তখন লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশক, এই তিনে-এক একে-তিন হইয়া ছিলাম, কেবল বিজ্ঞাপন দিবার কাছে আমার দাদা আমার সহযোগী ছিলেন।”[১৪]

আট বছর বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা চর্চার শুরু তারপর একের পর এক কবিতা রচনা করে তিনি পাঠক সমাজকে মোহিত করেছেন। ‘বনফুল’, (১৮৭৫খ্রিঃ), ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’ (১৮৮২খ্রিঃ) থেকে শুরু করে চিত্রা, (১৮৯৬খ্রিঃ), চৈতালী (১৮৯৬খ্রিঃ), ‘মানসী’ (১৮৯০খ্রিঃ), ‘সোনার তরী’র (১৮৯৪খ্রিঃ) মত কাব্য তিনি প্রকাশ করেছেন। পূর্বের কবিতা চর্চার এই ঐতিহ্যকে ধারাবাহিকভাবে রূপ দেন ‘নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে’।

‘নবপর্যায়ে বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় পাঁচ বছর সম্পাদকার পদে রবীন্দ্রনাথ নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর সময়কাল ছিল ১৩০৮ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩১২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। প্রতিটি বর্ষেই অন্যান্য কবিদের মতো, তিনিও অনেক কবিতা রচনা করেছেন। স্বাভাবিকভাবে ১৩০৮ বঙ্গাব্দেও রবীন্দ্রনাথের কবিতা চর্চার সৃজনী শৈলী লক্ষণীয়। এই ১৩০৮ বঙ্গাব্দে তিনি যে সমস্ত কবিতা প্রকাশ করেছিলেন সেগুলি হল:

(১) প্রার্থনা (বৈশাখ, ১৩০৮বঃ)

(২) কবিচরিত (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮বঃ)

(৩) কবির বিজ্ঞান (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮বঃ)

(৪) জগদীশ চন্দ্র বসু (আষাঢ়, ১৩০৮বঃ)

নিম্নে এই কবিতাগুলিকে বিশ্লেষণ করে, তার নির্জাস রশকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

‘প্রার্থনা’ কবিতাটি ‘নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে’র প্রথম সংখ্যা, বৈশাখেই প্রকাশ পায়। ‘নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে’র ‘সূচনা’ অংশটি লেখার পরেই, তিনি ‘প্রার্থনা’ কবিতাটি লেখেন। কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ মানুষকে বিদেশ প্রেমে জাগরিত হয়ে ওঠার কথা বলেন। মানুষকে নিজের চিন্তিত সত্তায় আরও সাহসী, আরও উন্মক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

“চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী।”[১৫]

কবি রবীন্দ্রনাথ এই ‘প্রার্থনা’ কবিতায় মানুষকে একত্রিত হওয়ার ডাক দেন। কেননা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, ইংরেজ সরকার তথা অত্যাচারি শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধতার। প্রয়োজন মানুষকে সর্বদিক দিয়ে সক্ষম করে তোলা। অলসের মত বাঙালি জীবনধারা নয়, বরং তেজস্বিতা, কর্মবহুলতা ও একতার নির্মিত সমন্বয়েই মানুষ তার অধিকার অর্জন করবে। তাই রবীন্দ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে :

“বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে

উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্ধারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে ধর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়।”[১৬]

রবীন্দ্রনাথ কখনও মাথা নত করেননি। অত্যাচার, শোষণ যতই প্রবল হোক না কেন সবের বিরুদ্ধেই তিনি গর্জে উঠেছেন। প্রতিবাদ করেছেন অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে। তাই তিনি সকল ভারতবাসীকে পৌরুষের ক্ষমতা অর্জন করার কথা বলেছেন। মানুষকে খর্ব বিষয়ে তিনি আনন্দে থাকার কথা বলেছেন। কবিতার শেষে তাই রবীন্দ্রনাথের মুখে উচ্চারিত হয়েছে, তীব্র বাণী:

“নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিত:,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।”[১৭]

রবীন্দ্রনাথের এই বাণী ছিল স্বদেশকে জাগ্রত করার বাণি, মানুষকে চিত্তে জাগিয়ে তোলার বাণী, ব্রিটিশ সরকারকে পরাস্ত করে স্বাধীনতার আস্বাদ গ্রহণ করার বাণী।

‘নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে’ দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশ পায় ‘কবিচরিত’ কবিতাটি। এর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের ‘নকলের নাকাল’ প্রবন্ধটি প্রকাশ পায়। ‘কবিচরিত’ কবিতাটি কবির দার্শনিক সত্তার এক গভীর উপলব্ধি। তাঁর দৃষ্টিতে কবির জগৎ একটা আলাদা জগৎ। সেই জগৎ সাধারণ মানুষ থেকে অনেকটা ভিন্ন। কবির সৃষ্ট জগৎ অনেক বেশি আভ্যন্তরীণ, অনেক বেশি রহস্যপূর্ণ। বাইরের চাকচিক্য নয় বরং আভ্যন্তরীণ মনোজগতেই তার সত্তা বিরাজ করে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন :

“বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুঃখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে—
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে।”[১৮]

এই একই ভাবনা লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথের ‘সাহিত্যের তাৎপর্য’ প্রবন্ধে। যেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেন, “এই যে মানুষের জগৎ ইহা আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে বহিয়া আসিতেছে। এই প্রবাহ পুরাতন ও নিত্যনতুন। নব নব ইন্দ্রিয় নব নব হৃদয়ের ভিতর দিয়া এই সনাতন স্রোত চিরদিনই নবীভূত হইয়া চলিয়াছে।”[১৯]

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, কবির সত্তা লুকিয়ে থাকে প্রকৃতির মধ্যে। সাগর, মেঘ, ফুল, বৃক্ষ প্রভৃতির সঙ্গে মায়ার জালে আবদ্ধ কবিসত্তা। সে সত্তা বাহ্যিক ভাবে ধরা দেয় না, ধরা দেয় আভ্যন্তরীন মায়ার আবদ্ধে। কবির সত্তা ফুটে ওঠে দুঃখে রাগিনী হয়ে, আবার কখনও বা লাজুক হৃদয়ের মর্মব্যাথা হয়ে। তাই কবি রবীন্দ্রনাথ বলেন :

“তোমাদের চোখে আঁখিজল ঝরে ববে
আমি তাহাদের গেঁথে দিই গীত রবে,
লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে
সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।”[২০]

তাই কবির আপ্তবাক্য স্বাভাবিক বাহ্যিক উন্মোচনে কবিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। বদ্ধ ঘরে কবিকে পাওয়া না, স্তুতিনিন্দার জ্বরে কবিকে পাওয়া যায় না, এমনকি জীবন চরিতেও কবিকে খুঁজকে পাওয়া যায় না। কবিকে পাওয়া যায়—

“যে আমি স্বপন-মুরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি।”[২১]

‘কবির বিজ্ঞান’ কবিতাটিও ‘নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে’র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ‘কবিচরিত’ কবিতাটির পরেই রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি প্রকাশ করেন। এই কবি তার মুখ্য বিষয় রূপে অর্ন্তযামীর কথা আছে। যে অন্তরযামী কবির কাছে একমাত্র সত্য। কবি বলেছেন, “এ নিখিলে আর কিছু নাই, শুধু এক আছে।”[২২] কবি তাই কখনও কখনও বিস্ময়ে অবিভূত হন। কবি বুঝতে পারেন না। প্রকৃতির এই রহস্য ভারকে। তাই কবি বলেছেন :

" 'আছি আমি'
এ কথা স্মরিলে মনে মহান্ বিস্ময়
আকুল করিয়া দেয়, স্তব্ধ এ হৃদয়
প্রকান্ত রহস্য ভারে।"[২৩]

তবে কবি একথা স্বীকার করেছেন, এই প্রকাণ্ড প্রকৃত রাজ্যই একমাত্র ভবিতব্য। সেখানে তিনি এক বিশ্বস্বরূপ। 'বিশ্বপ্রকৃতির এই বিরাট জগতে কেবল মায়া। তাই কবিতার শেষে রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি :

"একমাত্র তুমি জান এ ভবসংসারে
যে আদি গোপন তত্ত্ব, আমি কবি তারে
চিরকাল সবিনয়ে স্বীকার করিয়া
অপরে বিস্ময়ে চিত্ত রাখিব ভরিয়া।"[২৪]

রবীন্দ্রনাথের 'জগদীশ চন্দ্র বসু' কবিতাটি 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে' আষাঢ়, তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'জগদীশ চন্দ্র বসু' কবিতার পূর্বে তিনি জগদীশ চন্দ্রকেই নিয়ে লেখা প্রবন্ধ 'আচার্য্য জগদীশের জয়বার্ত্তা' (আষাঢ়, ১৩০৮বঃ) প্রকাশ করেন। আসলে জগদীশ চন্দ্র বসুর সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বন্ধুতুল্যও বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, বিজ্ঞান জগদীশ চন্দ্র বসু দেশের মান তুলে ধরবে। তাই রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসুর বিদেশে থাকাকালীন, যেমন তাঁকে আত্মবিশাও গিয়েছেন, তেমনি বিদেশী সমালোচকদের প্রতিও ধীক্কার জানানোর কথা বলেছেন, সমালোচকেরা এও বলেন যে রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ চন্দ্র বসুর বিজ্ঞান চর্চার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন ছিল, তা তিনি কিছুটা নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্র বক্তব্যেও তার পরিচয় আমরা পাই। নাথ বলেন, "তোমাকে বারম্বার মিনতি করিতেছি - অসময়ে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিও না, তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর - দৈত্যের সহিত লড়াই করিয়া অশোক বন হইতে সীতা-উদ্ধার তুমিই করিবে, আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাঁধিয়া দিতে পারি তবে আমিও ফাঁকি দিয়া স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিব।"[২৫] এমনকি জগদীশ চন্দ্র বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক এতই মধুর ছিল যে, 'বঙ্গদর্শন' গ্রহণের পূর্ব ও পরবর্তী সব সময়েই, রবীন্দ্রনাথ জগদীশের মতামত গ্রহণ করতেন। 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সংখ্যা বেরোনোর পর তিনি জগদীশকে জানান :

"বঙ্গদর্শন প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে। নানা হাঙ্গামে আমি মন দিতে পারিনি - অনেক ভুলচুক থেকে গেছে। আমার একটা কবিতা এমন বিকৃত হয়ে গেছে তার মানেই বোঝা যায় না। তোমাকে পাঠিয়ে দিতে বলে দেব।"[২৬]

'জগদীশ চন্দ্র বসু' কবিতায়, জগদীশ চন্দ্রের প্রতি কবি রবীন্দ্রনাথের স্তুতিই ধরা পরেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ঋষির সঙ্গে তুলনা করেছেন। শুষ্ক পাষাণ নগরীতে তাঁকে একমাত্র যোদ্ধা হিসেবে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"ভারতের কোন বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি
হে আর্য আচার্য্য জগদীশ। কী অদৃশ্য তপোভূমি
বিরচিলে এ পাষাণনগরীর শুষ্ক ধূলিতলে।"[২৭]

কবিতায় রবীন্দ্রনাথ জগদীশকে একমাত্র বিজ্ঞানের সাধক হিসেবে তুলি ধরেছেন। তিনি বলেছেন, জগদীশ চন্দ্র শান্ত, স্তব্ধ, ধ্যানের মাধ্যমে বিদেশে, দেশের গৌরব, হাতির গৌরব ফিরিয়ে এনেছেন। তাই পরম গৌরবের সঙ্গে আপ্তবাক্যের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন :

"মোরা ববে
মত্ত ছিনু অতীতের অতিদূর নিস্ফল গৌরবে—
পরবস্ত্রে, পরবাক্যে, পরভঙ্গিমার ব্যঙ্গরূপে
কল্লোল করিতেছিনু স্ফীতকণ্ঠে ক্ষুদ্র অন্ধকূপে—
তুমি ছিলে কোন দূরে।"[২৮]

তাই জগদীশের কাছেই কবি, তাঁর শিষ্যদের তাঁর বিজ্ঞান সাধনার তথা চর্চার ব্রতী হতে অনুরোধ করেছেন। এবং কবি রবীন্দ্রনাথ ডাক দিয়েছেন, ভারতের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনার, ও স্বদেশের মন্ত্রে দেশকে উজ্জীবিত করার। জগদীশ চন্দ্র বসুকে তাই বলেছেন, "ডাক দাও তব শিষ্যদলে, একত্রে দাঁড়াক তারা তব হোমহুতাগ্নি ঘিরিয়া।"[২৯]

কবি রবীন্দ্রনাথ, এই 'জগদীশ চন্দ্র বসু' কবিতাটি লেখার পর, জগদীশ চন্দ্র বসুকে একটি চিঠি লিখেন। এবং তার সঙ্গে, তাঁকে নিয়ে লেখা এই কবিতাটিও কবি তাঁকে প্রেরণ করেন। চিঠিতে জগদীশ চন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, যে ঈশ্বর তোমার

দ্বারাভারতের লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন আমি তাঁহার চরণে আমার হৃদয়কে অবনত করিয়া রাখিয়াছি। ... তোমার নিকট পূজা প্রেরণ করিবার জন্য আমার অন্তঃকরণ উন্মুখ হইয়া আছে - বন্ধু, আমার পূজা গ্রহণ কর। তোমার জয় হউক্। তোমাতে আমাদের দেশ জয়ী হউক। নব্য ভারতের প্রথম ঋষিরূপে জ্ঞানের আলোকশিখায় নূতন হোমাগ্নি প্রজ্বলিত কর।”[৩০]

‘নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ‘প্রার্থনা’ কবিতাটি পরে ‘নৈবেদ্য’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত হয় এবং ‘কবিচরিত’, ‘কবির বিজ্ঞান’ ও ‘জগদীশ চন্দ্র বসু’ কবিতাগুলি ‘উৎসর্গ’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত হয়। এই কবিতাগুলির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের জন্য মানুষের চিত্তকে যেমন দোলায়িত করেন, তেমনি অপরদিকে বিজ্ঞান চর্চায় জগদীশ চন্দ্র বসুর অবদানকেও তুলে ধরেন। আবার একদিকে যেমন কবির মনোজগতের কথা তুলে ধরেছেন, তেমনি অপরদিকে প্রকৃতির সঙ্গে কবির একাত্মতার কথাও ব্যক্ত করেছেন। সব মিলিয়ে ‘নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে’র প্রথম বর্ষে রবীন্দ্র কবিতায় স্বদেশ, বিজ্ঞান, সাহিত্য একই সুরে সমাহিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : রূপ ও অরূপ, ..., রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ফাল্গুন ১৪২২, পৃ. ৫২২
২। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লেখা পত্র, বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, অষ্টাদশ মুদ্রণ : আশ্বিন ১৪২৩, কলকাতা-৯ পৃ. ৯৬৮
৩। দত্ত। ভবতোষ ও সরকার, বিজলি : বঙ্গদর্শন পরম্পরা, বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র, প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ২০০৬, কাঁঠালপাড়া, উত্তর চব্বিশ পরগণা, পৃ. ৩৭
৪। মজুমদার, শ্রীশ চন্দ্র : নিবেদন, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, প্রথম বর্ষ, ১৩০৮, মাসিক পত্র
৫। মজুমদার, শ্রীশ চন্দ্র : নিবেদন, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, প্রথম বর্ষ, ১৩০৮, মাসিক পত্র
৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : চিঠিপত্র-৮, পত্র-১৩৭, বিশ্বভারতী, সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৩৯৯, কলকাতা-১৭, পৃ.১৬০
৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : চিঠিপত্র-৮, পত্র-১৩৯, বিশ্বভারতী, তদেব, পৃ. ১৬২
৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : চিঠিপত্র-৮, পত্র-১৩৯, বিশ্বভারতী, তদেব, পৃ. ১৬৩
৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : চিঠিপত্র-৬, পত্র-১০, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০১৫, কলকাতা-১৭, পৃ. ১৬২
১০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : সূচনা, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, প্রথম বর্ষ, ১৩০৮, মাসিক পত্র, পৃ. ৪
১১। সিংহ, মীনাক্ষী : রবীন্দ্র প্রবন্ধের রূপরেখা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : কলকাতা বইমেলা ২০১১, কলকাতা-৯ পৃ. ১৪
১২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : কবিতা-রচনারম্ভ, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ফাল্গুন ১৪২২, পৃ. ৪২৩
১৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : কবিতা-রচনারম্ভ, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, তদেব, পৃ. ৪২৩
১৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : কবিতা-রচনারম্ভ, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, তদেব, পৃ. ৪২৩
১৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : নৈবেদ্য, ৭২ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ২৯৯
১৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : নৈবেদ্য, ৭২ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ২৯৯
১৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : নৈবেদ্য, ৭২ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ৩০০
১৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : কবিচরিত, ২১ সংখ্যক কবিতা উৎসর্গ রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, পৃঃ ৯৭
১৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, তদেব, পৃ. ৬১৯
২০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : কবিচরিত, ২১ সংখ্যক কবিতা, উৎসর্গ, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, তদেব, পৃ. ৯৭
২১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : কবিচরিত, ২১ সংখ্যক কবিতা, উৎসর্গ, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, তদেব, পৃ. ৯৮
২২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : কবির বিজ্ঞান, ২২ সংখ্যক কবিতা, উৎসর্গ, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, তদেব, পৃ. ৯৮
২৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : কবির বিজ্ঞান, ২২ সংখ্যক কবিতা, উৎসর্গ, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, তদেব, পৃ. ৯৮
২৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : কবির বিজ্ঞান, ২২ সংখ্যক কবিতা, উৎসর্গ, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, তদেব, পৃ. ৯৮
২৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : চিঠিপত্র-৬, পত্র-১২, বিশ্বভারতী, তদেব, পৃ. ২৮
২৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : চিঠিপত্র-৬, পত্র-১১, বিশ্বভারতী, তদেব, পৃ. ২৭
২৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : জগদীশ চন্দ্র বসু, ৩০ সংখ্যক কবিতা, উৎসর্গ, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, তদেব, পৃ. ১০৩
২৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : জগদীশ চন্দ্র বসু, ৩০ সংখ্যক কবিতা, উৎসর্গ, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, তদেব, পৃ. ১০৩
২৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : জগদীশ চন্দ্র বসু, ৩০ সংখ্যক কবিতা, উৎসর্গ, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, তদেব, পৃ. ১০৪
৩০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : চিঠিপত্র-৬, পত্র-১২, বিশ্বভারতী, তদেব, পৃ. ২৮